Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka.

# আলোচনা

মানসী রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তির কাব্য কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির কাব্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বীণায় বহু তার, তাহার নানা তারে নানা সুরের সংগীত ঝংকৃত হইয়াছে। কিন্তু সব সংগীত তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভাজাত নহে। এই বিশিষ্ট কবিপন্থায় তিনি নিশ্চিতরূপে সোনার তরী কাব্যে আসিয়া পৌছিয়াছেন। কিন্তু ইহার সূচনা সন্ধ্যাসংগীত হইতে। সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থে একটি পরীক্ষামূলকতার ভাব আছে। সে পরীক্ষা তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির স্বরূপ—অন্বেষণে। একদিকে সন্ধ্যাসংগীত; প্রভাতসংগীত; আবার একদিকে ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল। আর মানসীতে এই দুই কাব্যরীতির মুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। এখন এই দুটি কাব্যরীতি কী? কবির একখানে কাব্যরীতির মুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। এখন এই দুটি কাব্যরীতি কী? কবির একখানি কাব্যের নামের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় ছবি ও গান। তাহার কাব্য চিত্ররীতি অবলম্বন করিবে না সংগীতরীতি অবলম্বন করিবে, নিজের অগোচরে কবি যেন তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ের সংগীতরীতির পরীক্ষা, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে প্রধানত চিত্ররীতির পরীক্ষা। মানসীতে এই দুই রীতিই আছে। সোনার তরীকে যে তাঁহার বিশিষ্ট রীতির কাব্য বলিয়াছি, তাহার কারণ এই কাব্য হইতে চিত্ররীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। একেবারে হইয়াছে এমন নয়; কল্পনা কাব্য প্রধানত চিত্ররীতির কাব্য,মহুয়া কাব্যেও চিত্ররীতি কবিতা আছে। কিন্তু তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম রূপেই থাকিয়া নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা যেন প্রমাণ করিতেছে।

এইজন্যই মানসীতে পরিণত শক্তির কবিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাপর্বের শেষ কাব্য। পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্বের আদি কাব্য নহে। মানসীতে আসিয়া একটা পথের শেষ; সোনার তরীতে আর একটা স্রোতের আরম্ভ, যে স্রোত দীর্ঘ জীবনের অভাবনীয় বঙ্কিমতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের সমুদ্র—সংগম পর্যন্ত প্রবাহিত।

এইজন্যই মানসীতে পরিণত শক্তির কবিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাপর্বের শেষ কাব্য। পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্বের আদি কাব্য নহে। মানসীতে আসিয়া একটা পথের শেষ; সোনার তরীতে আর একটা স্রোতের আরম্ভ, যে স্রোত দীর্ঘ জীবনের অভাবনীয় বঙ্কিমতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের সমুদ্র-সংগম পর্যন্ত প্রবাহিত।

কাব্যে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতি বলিতে ঠিক কী বুঝায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিপ্রতিভা বস্তুর রূপকে ধরিবার প্রতিভা নয়; বস্তুর স্বরূপকে ধরিবার প্রতিভা। সেইজন্য যাহা কিছু একান্তভাবে স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক তাহার চেয়ে সর্বস্থানিক, সর্বকালিক ও সর্বব্যক্তিক তাঁহাকে বেশি আকর্ষণ করে। এটাকেই বলা চলে বস্তুর স্বরূপ। বস্তুরূপে পৌছিবার উপায় চিত্র; আর বস্তুস্বরূপে পৌছিবার উপায় সংগীত; সেইজন্য সংগীতকেই তিনি তাঁহার বিশিষ্ট বাহন করিয়া লইয়াছেন। সংগীত নিজে অশরীরী বলিয়া অশরীরী স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম।

মানসীতে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির কবিতা আছে। তাহার প্রারম্ভে চিত্ররীতি পরিণামে সংগীতরীতি। তাহার এক কোটিতে মেঘদূত, অন্য কোটিতে সুরদাসের প্রার্থনা। মাঝখানে নানা বিচিত্র পর্যায়ের কাব্য আছে, বিশেষ বিশেষ কারণে সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের অনুসরণে এই দুই রীতির কাব্যের যেমন গুরুত্ব তেমন আর কোন পর্যায়ের নহে।

কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের অনুবাদ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক—কিন্তু তাহার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। সন্ধিসমাস স্বরব্যঞ্জনের গুরুলঘুতার প্রতি উদাসীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ একপ্রকার অসম্ভব। কালিদাসের *মেঘদূতের* বাংলা ভাষায় সার্থকতম রূপ মানসীর *মেঘদূত* কবিতা। ইহা অনুবাদও নয়, আবার মৌলিকও নয়, ইহাকে মৌলিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাতকে পরিচালিত করিতেছেন অন্য একজন, এমনি এক অসম্ভব প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য কবিতাটির সৃষ্টি। এই কবিতাসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মন এবং আধুনিক মন; কিন্তু ইহার কাব্যরীতিটি কালিদাসীয়। কালিদাসের কাব্যরীতি বস্তুরূপকে ধরিতে সচেষ্ট, বস্তুরূপের ভিতর দিয়াই তিনি বস্তুরূপকে ফুটাইয়া তোলেন, যেমন বস্তুস্বরূপের ভিতর দিয়া বস্তুরূপকে ফুটাইতে রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত। বস্তু রূপে পৌছিবার মাধ্যম ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের সেরা চোখ। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই মেঘদূত ইন্দ্রিয়নির্ভর, ইন্দ্রিয়বিলাসী কবির কাব্য : চোখ দেখিয়াছে, তুলি আঁকিয়াছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ছবির রং কবির ভালোমন্দ—লাগা দিয়া গুলিয়া লওয়া। বিধাতা যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই দিলাম, দেখো এবং দেখিয়া ইহার রসরূপে গিয়া পৌছিতে চেষ্টা করো, কাব্যে চিত্ররীতি অনেকটা সেই রকম। কবি বিধাতার জগতের সমান্তরাল আর-একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলেন—এই সৃষ্টি করিলাম, ইহাকে ভোগ করার দ্বারা ইহার রসরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করো। কবি ও বিধাতা উভয়েই সাঙ্খ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং নির্বিকার। আর সংগীতরীতির কবি সাঙ্খ্যের প্রকৃতির মতো সক্রিয় পাঠকাপেক্ষী এবং চঞ্চল। তিনি সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত নহেন; সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য না বুঝাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই। তিনি যেন বলেন-আমি বাঁশীর সুরে বস্তুররূপ উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করো। তোমাকে বাহির দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আমার চিন্তা মেটে না, তুমি না বোঝা পর্যন্ত আমার সৃষ্টির সার্থকতা নাই। এইজন্যই মানসীর *মেঘদূতের* শেষে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—কারিদাস তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

ভাবিতেছি অর্ধ রাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে.
মানস সরসী—তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি, সকলের শেষে।



কালিদাস এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝেন নাই; রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাখ্যা না দিয়া কবিতাটি শেষ করিতে পারেন নাই। এ কয়টি ছত্র লিখিবার সময়ে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ বস্তুরূপের সৃষ্টি চলিতেছিল, এই কয়টি ছত্র বস্ত্রস্বরূপের উদ্‌ঘাটন। কবিতাটির চরম লগ্নে চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি সংগীতরীতি অবলম্বন করিয়া সুরের সিঁদকাঠি দিয়া একেবারে জগতের প্রেমরহস্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কাব্যে সংগীতরীতি। মেঘদূত কাব্যে দুইটি রীতিরই পরিচয় পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত কোটির কবিতা সুরদাসের প্রার্থনা। ইহা সংগীত রীতিরকাব্য। সুরদাস অন্ধ এবং গায়ক। কালিদাস চক্ষুষ্মান কবি। কাব্য—অমরার তিনি সহস্র চক্ষু। কালিদাস ও সুরদাসকে কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের অগোচরেই যেন এই দু রীতির আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। মানসীর কবিতাগুলি নূতন করিয়া সাজাইবার অধিকার পাইলে প্রারম্ভে মেঘদূতও প্রান্তে সুরদাসের প্রার্থনা বিন্যাস করিয়া চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির মর্মে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।

সুরদাস দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, একদা আমি তোমাকে চোখের দৃষ্টিতে দেখিয়া তোমার বিলাসের মূর্তি দেখিয়াছি, সে আমারই অপরাধ। এবার আমি চোখের দৃষ্টি ঘুচাইয়া দিয়া তোমাকে দেখিতে চাই, এখন কেমন করিয়া তোমার নির্মল মূর্তি ঢাকিয়া রাখিবে? এই দেবী কে? সুরদাস যেখানে প্রেমিক সেখানে এই দেবী নিশ্চয় তাহার প্রেমের আশ্রয়। সুরদাস যেখানে কবি সেখানে এই দেবী তাহার সরস্বতী। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের কোন ইতিহাস লুক্কায়িত আছে তাহা উদঘাটিত করিবার চেষ্টা বৃথা—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের যে মানসিক ও শিল্প ইতিহাস অবগুণ্ঠিত আছে তাহার মূল্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দেবী তাহার কাব্যলক্ষ্মী বা সরস্বতী, এই দেবী তাহার জগৎ-মূর্তি, চোখের দৃষ্টিতে যাহার রূপ মাত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, এবারে ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে তিনি উদগ্রীব। এই দেবী এতদিন চিত্ররীতির আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এবার সংগীতরীতিতে তিনি কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করুন। কবির শিল্প চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া সংগীতরীতিতে সংক্রমণ করিতেছে-সুরদাসের প্রার্থনা তাহার পাতকীস্থান।

জান কি আমি এ পাপ—আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপান ধেয়ে,
এবারে—
আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম;
লও, বিধে দাও বাসনা-সাঘন
এ-কালো নয়ন মম।

সুরদাস বলিতেছে কেবল দেবীমূর্তি নয়, এই বিশ্বভুবনের সৌন্দর্য চোখের দৃষ্টিতে মাত্র ধরা দিয়াছে-কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি কই? বিশ্বভুবনের সৌন্দর্যমাত্র নয়, সৌন্দর্য স্বরূপ না দেখা অবধি শান্তি নাই।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।
যাক, তাই যাক! পারি নে ভাসিতে
কেবল মুরতিস্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোকগমন
মুরতি-ভুবন হতে।

প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন : কাজেই তাঁহার কাব্যে আদিম পর্ব হইতে প্রকৃতির প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রীতি এক কথা, পরিচয় আর-এক কথা। প্রকৃতির বিশিষ্ট মূর্তির সঙ্গে কবির পরিচয় পরবর্তীকালে ঘটিয়াছে, সে এই মানসী কাব্যের কাল। মানসী কাব্যে আসিয়া রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রকৃতি-স্থানিক মূর্তির পরিচয় মেলে। ইহার পূর্বে যে প্রাকৃতিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রীতিজাত বটে, কিন্তু তেমন করিয়া অভিজ্ঞতা-জাত নহে।[১] আবার মানসীর পরে অজস্র প্রকৃতিচিত্র তাঁহার কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেগুলি মূলতঃ মানসীর চিত্র হইতে ভিন্ন। এই প্রভেদটা কিসের? ইহা বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপের ভেদ। সেইজন্য মানসীর স্থানিক চিত্র পরবর্তী কাব্যে সর্বস্থানিক হইয়া উঠিয়াছে।

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
শিশুগাছ পাড়ু—কিশলয়,
নিম্নবৃক্ষ ঘন শাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।
বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙ্গে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল; বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।

১ অচলিত সংগ্রহের কোনো কোনো কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনার অভিজ্ঞতার প্রমাণ আছে।



এই শ্রেণীর স্থানিক লক্ষণযুক্ত চিত্র মানসীর পরে বিরল; এই জাতীয় স্থানিক চিত্র গদ্য-কবিতায় পৌছিবার আগে আর বেশী মিলিবে না; সে তো কবির শেষ জীবনের কথা। কি মানুষ, কি প্রকৃতি দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ চিত্ররীতি ত্যাগ করিয়া সংগীতরীতির পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখন *মেঘদূত* ও সুরদাসের প্রার্থনাকে দুই কোটি বলিয়া স্বীকার করিলে অনেকগুলি কবিতা স্বতঃই বিভক্ত হইয়া দুই কোটি প্রান্তে গিয়া পড়ে। এবারে যে সব কবিতার উল্লেখ করিব, সেগুলি 'সুরদাসের প্রার্থনা'র সগোত্র এবং বস্তুরূপের বা সংগীতরীতির অন্তর্গত কবিতা। নিষ্ফল কামনা, একাল ও সেকাল, মরণ-স্বপ্ন, ধ্যান, মেঘের খেলা, নিস্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম প্রভৃতি কবিতায় বস্তুরূপকে লঙ্ঘন করিয়া বস্তুরূপে পৌছিবার চেষ্টা অতিশয় স্পষ্ট। এগুলিও প্রেমের কবিতা। কিন্তু ইহাদের জন্মলগ্নে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টির অনুপ্রেরণা নাই, প্রেমের দেহহীন ভাবমূর্তি দ্বারা এগুলি উদ্বোধিত। মেঘদূত শ্রেণীর কবিতায় যে বিশিষ্ট স্থানিকতা, কালিকতা, যে বিশিস্ট ব্যক্তি—মূর্তি আছে, এ সব কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যপ্তিহারা শূন্য সিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অনন্ত কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই সিন্ধু-পারাবার।

মানসী কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'উপহার' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে,

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

মানসী কাব্যের কবি অসীমের সীমা টানিবার প্রয়াসী। মেঘদূত ও তৎশ্রেণীর কাব্য সসীমের কোটি, সুরদাসের প্রার্থনা ও তৎশ্রেণীর কাব্য অসীমের কোটি। অসীমের সীমা তখনি রচনা সম্ভব হয়, যখন সসীম অসীমে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্ত ও সান্ত বা Ideal ও Real-এর—সমন্বয় ঘটে। অনন্ত ও সান্তের সে দুরূহ সমন্বয় মানসীতে ঘটে নাই, পরবর্তী কাব্যে ঘটিয়াছে কি না তাহা পরে আলোচ্য, কিন্তু মূল কথাটা এই যে, এই দুরূহ সমন্বয়ের দিকেই কবির প্রতিভাও সিদ্ধতীর্থযাত্রী; এই দুরূহ সমন্বয়স্বরূপ সিদ্ধি ব্যতীত যে কবি জন্মের সার্থকতা নাই, সে বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ। মানসী কাব্য এই দুই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত কোটিযুক্ত বিরাট হরধনুতে জ্যা আরোপ করিবার প্রাথমিক প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন,
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

কিম্বা ...

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ,
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

এই দুটি কাব্যাংশ অসীমের সীমা রচনার ব্যর্থতাজাত ক্ষুব্ধতা। অসীমের সীমা রচনা করা সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু এটুকু কবি বুঝিতে পারিলেন যে, সীমার মধ্যে ছলনাময় একটা অসীমা সত্তা রহিয়াছে। ওটুকু বড় কম লাভ নয়। প্রেমিক সসীম, প্রেম অসীম; এ দুয়েরই রহস্য কবিকে আকর্ষণ করিতেছে,কিন্তু কি উপয়ে যে এই দুই বিরুদ্ধ সত্তাকে মিলিত করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা কবি বুঝিতে অক্ষম। প্রেমিক ছাড়া প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়? উপলব্ধি কেমন করিয়া হয়? আর প্রেমিককে বুকে টানিতে গিয়া দেখা যায—

দেহ শুধু হাতে আসে!

একাল ও সেকাল কবিতায় অসীমের সীমা রচনার আর-একটা চেষ্টা। একটি বিশেষ দিনের বর্ষা চিরকালীন বর্ষার ভুমিকায় আজ দন্ডায়মান; একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমিকার কথা মনে হইবা মাত্র চিরকালীন প্রণয়িনীর মুখ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লৌকিক বৃন্দাবন অলৌকিক সত্তায় মানুষের মনে বিরাজমান এবং সেদিনকার সেই বংশীধ্বনিত কুটীরপ্রান্তের রাধিকা লৌকিক বিরহীর বিষাদের তমালচ্ছায়া নিবিড় সুপ্তপ্রায় বনপথ দিয়া চিরকালীন অভিসারিকার বেশে যাত্রা করিয়াছে। একাল ও সেকাল কবিতায় এই দুই বিপরীত ধর্মের সার্থক মিলন যেমন ঘটিয়াছে এমন আর মানসীর কোন কবিতায় নহে। *মেঘদূত* ও সুরদাসের প্রার্থনা যদি দুই প্রান্ত হয় তবে একাল ও সেকাল তাহাদের মিলনবিন্দু।

মানসীতে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ছন্দরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহাকে মুক্তপয়ার বলা যাইতে পারে। *মেঘদূত* ও অহল্যার প্রতি কবিতা নবপ্রবর্তিত মুক্তপয়ারে লিখিত। মুক্তপয়ার অমিত্রাক্ষর ও পয়ার মিলাইয়া গঠিত। ইহাতে অমিত্রাক্ষরের যদিপাতের স্বাধীনতার সহিত পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস মিশ্রিত। এই ছন্দরূপ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাব প্রকাশের একটি প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বহু কবিতায় ও নাটকে এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় কবি ইহাকে নিজের শক্তির অনুকুল বাহন বলিয়া মনে করিতেন। মধুসুদনের পক্ষে যেমন অমিত্রাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমনি এই মুক্ত পয়ার।

এবারে মানসীর কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার উল্লেখ করিব—বর্তমান লেখকের মতে এইগুলিই মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। *মেঘদূত অহল্যার প্রতি, একাল ও সেকাল, কুহুধ্বনি* এবং *সিন্ধুরতরঙ্গ*। *মেঘদূত* সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

অহল্যার প্রতি'কে, সোনার তরীর *'বসুন্ধরা'* কবিতার প্রথম খসড়া বলিয়া ধরা উচিত। অহল্যা বসুন্ধরা, আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীবমাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী, অন্নদায়িনী ছিল না; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল—



মেরুতে মরুতে ও নির্বান্ধব আদিম অরণ্যে শ্বাপদসংকুল দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্নদাক্ষিণ্যে জীবমাত্রকেই আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অহল্যার এখনো সে অভিশাপের অবস্থা সম্পূর্ণ কাটে নাই—কেবল সে অভিশাপমুক্ত হইয়া মাতৃত্বের মধ্যে নূতন জন্মলাভ করিবার মুখে। কাজেই অহল্যার প্রতি যেখানে শেষ, বসুন্ধরার সেখানে সূচনা। এইভাবে দুটিকে মিলাইয়া পড়িলে দুটিরই পূর্ণতর রূপ উপলব্ধি হইবে।

*একাল ও সেকাল* সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। এই নিখুঁত ক্ষুদ্র কবিতাটির একমাত্র খুঁত ইহার ষষ্ঠ শ্লোক—সেখানে বিরহিণী যক্ষনারীর চিত্র উদঘাটিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে পথিক বধূর উল্লেখ থাকিলেও সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় নহে। এই ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে রসের জটিলতার স্থানাভাব—প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি এর রসত্বই ইহার সাফল্যের প্রধান কারণ। একালের বিরহের প্রতিবিম্ব সেকালের রাধার বিরহের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে—আগাগোড়াই যমুনা ও বৃন্দাবনবিহারিণী বিরহিরণীর চিত্র—তন্মধ্যে এই শ্লোকে কালিদাসের যক্ষনারী আসিয়া পড়াতে রসবোধের অখন্ডতা খন্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শেষ দুই শ্লোকে একালের বিরহ ও সেকালের বিরহকে চিরকালের বিরহের সংগীতের মধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়া চিরকালীন বিরহব্যথা ধ্বনিত করিয়া তোলা হইয়াছে।

*কুহুধ্বনি* রবীন্দ্রনাথের একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই কবিতাটির উপরে কীট্‌সের *নাইটিংগেল* কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। কীট্‌সের *নাইটিংগেল* পৃথিবীর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা; *কুহুধ্বনির* পক্ষে সে দাবী কেহ উত্থাপন করিবে না। মৃত্যুশীল জন্মস্রোতের মধ্যে ওই নাইটিংগেলই জীবনের শাশ্বত রূপ-ইহাই কীট্‌সের বক্তব্য। কর্মস্রোতের সুরহীন তার কাটা সংগীতের মধ্যে ওই কুহুধ্বনির সৌন্দর্যের ও পূর্ণতার ধুয়ো বা ধ্রুবপদ ধরিয়া রাখিয়াছে। মানবজীবনে খন্ডিত সংগীতকে সে অনাদিকাল হইতে বিশ্বের সৌন্দর্য -অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সফল সে হোক বা না হোক, ওইটাই জীবনের শাশ্বত রূপ—যতক্ষণ না মানবের কন্ডিত জীবনসংগীত ওই অখন্ড রসরূপের সঙ্গে মিলিত হইতেছে, ততক্ষণ মানবের মুক্তি নাই। তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কাব্য বুঝিবার প্রয়াস বৃথা—কবিতাটি বারংবার পাঠ করা দরকার।

*সিন্ধুতরঙ্গ* রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কারণে *'সমুদ্রের প্রতি'* ইহার চেয়ে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত—কিন্তু সমুদ্রের কবিতায় যদি সমুদ্রের বিশেষ রূপ, বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ সঙ্গীত অনিবার্য হয়—তবে *সিন্ধুতরঙ্গ* কেবল যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, বাংলা ভাষাতেই ইহা শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যে যে শ্রেণীর সামুদ্রিক কবিতা আছে, বাংলা ভাষায় তাহার একান্ত অভাব—তার কারণ বাঙালী সমুদ্রচারী, সমুদ্রবিলাসী, সমুদ্রলালিত জাতি নহে। সমুদ্রকে আমরা কদাচিৎ দেখি, দূর হইতে দেখি—তাহার সহস্র মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। সেই অন্য সমুদ্রের কবিতা বাঙালি কবির হাতে সমুদ্রের রূপের কবিতা না হইয়া তাহার

স্বরূপের বা ভাবমূর্তির কবিতা হইয়া উঠে। ইংরেজি কবিতায় সমুদ্রের লবণাম্বুস্বর্শ, তাহার তান্ডব দোল, তাহার প্রলয় নৃত্য পাই, অথবা তাহার মুগ্ধ শান্ত শিশুসম রূপ পাই; যে ভাবেই পাই, বিশিষ্টভাবে সমুদ্রকেই পাই—বাংলায় তেমন সম্ভব নহে। *সিন্ধুতরঙ্গ* কবিতায় বাংলা কাব্যের সেই অভাব কিঞ্চিৎ পূরণ হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সমুদ্রের কবিতা—সমুদ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভাবনার প্রকাশ মাত্র নয়। ইহার বুকফাটা ছন্দের উদার নৈরাশ্যে মজ্জমান জাহানের ঝঞ্ঝোৎকণ্ঠে অন্তিম ক্রন্দন ধ্বনিত; জড় ও জীবে, বিশ্বের মঙ্গলময় পরিণামে ও আপাত নিষ্ঠুর ক্রিয়ায় যে মন্থন চলিতেছে—তাহার আন্দোলন অনুভূত হয় ছন্দ ব্যবহারে। শ্লোকের প্রথম চারটি ছত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, যেন তাহা ঝড়ের প্রাথমিক ঝাপটা; কিন্তু তার পরেই দীর্ঘায়ত চারটা ছত্র আসল ঝড়টার মতো একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়ে, বাঁচিলাম কি মরিলাম স্থির করিবার আগেই সে নিদারুণ ঝাপটা চলিয়া যায়—তখন আবার ক্ষুদ্রতর দুটো ছত্রে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থা। শেষে একটি একক ছত্র—একটু, নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ—

দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

ছন্দে ভাবে ছবিতে সমুদ্রের এমন অনিবার্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর নাই—এই দ্বিরুক্তি করিবার আমার রসবিস্ময় পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

(রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ)



# সূচনা

বাল্যকাল থেকে পশ্চিমভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি, এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম, ব্যবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই ; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপরপক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়োঘরের ঘরনী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম, তার একটা কারণ, এখানে ছিলেন আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার সর্ষের খেত ; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ সমর্‌খন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ন অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবা মাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল শিশুর কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। 'মানসী'ও সেইরকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত-অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৮.২.১৯৪০